সপ্তবিংশতি সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০২১

ফলা

রাজনীতি ○ অর্থনীতি ○ সমাজ-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

নারীর বঞ্চনা ● করোনা নিয়ে কুসংস্কার

আকবর কেন? ● প্র্যাগম্যাটিক প্রণব মুখোপাধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা

করোনা সংক্রমণ - ভিয়েতনাম কেন সফল

উষ্ণায়ন ● রাজ্যপালের ক্ষমতা

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার

সম্পাদনা

তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করোনা অতিমারী : জনঘনত্বর সাথে ভাইরাস সংক্রমণের সম্পর্ক
ভিয়েতনাম কেন সফল?

শ্যামল ভদ্র

লেখক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে করোনা অতিমারি এই শিক্ষাই দিয়েছে যে জনসংখ্যাকে বোঝা হিসেবে না দেখে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে হবে।

ফেলে আসা বছরটি পৃথিবীর বিপন্ন মানুষের কাছে এক বিভীষিকাময় অধ্যায়। এই অন্ধকার অনিশ্চিত সময়ের শেষ কোথায় এখনও মানুষের কাছে স্থির কোনও দিক্‌নির্দেশ নেই। এই পৃথিবী যে সমস্ত জীব-জন্তু ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীবদেরও বাসস্থান, তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ এই ক্ষুদ্র আধা-জৈবিক অণুজীবই মূল ত্রাসের কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিস্তীর্ণ অরণ্য-অঞ্চলের বিনাশ, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্যই ছিল। এই যুদ্ধে মানুষই হয়তো জয়লাভ করবে তার প্রখর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে, তাই এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে নতুন করে বাঁচার পথ তৈরি করতে হবে, অবশ্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যতটা সম্ভব দূর করে। বর্তমানে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ সেই সাথে মানুষের মৃত্যু ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, শীতকালে অতিমারী কতটা ক্ষতি করতে পারে তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। জানুয়ারি ০২, ২০২১ পর্যন্ত পৃথিবীতে মৃত্যু হয়েছে ১৮,২৯,০৮৫ জনের, সংক্রমিত হয়েছেন ৮,৪০,৬২২৮০ জন। পৃথিবীব্যাপী চলছে উপযুক্ত ভ্যাক্সিন ও ওষুধ আবিষ্কারের নিরলস প্রচেষ্টা, যা একমাত্র এই অতিমারীর কবল থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে। ফাইজার কোম্পানির mRNA Covid-19 ভ্যাক্সিন এখন আমেরিকা ও ইংল্যান্ড-এ প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে। আশা করা যায় আরও কয়েকটি ভ্যাক্সিন বা প্রতিষেধক টিকা শীঘ্রই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে। যতদিন না এই প্রতিষেধক টিকা সহজলভ্য হচ্ছে ততদিন মানুষকে আরও বেশি শৃঙ্খলার সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

এই করোনা-অতিমারীতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নত দেশ আমেরিকা ও ইউরোপ। আমেরিকার বর্তমান মোট লোকসংখ্যা ৩৩.৫ কোটি, আর জন-ঘনত্ব ৩৬ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। সে দেশের প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে, মূলত পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্তী শহরগুলিতেই বেশি। জার্মানির মোট লোকসংখ্যা ৮.৪ কোটি এবং ইংল্যান্ডের লোকসংখ্যা ৬.৮ কোটি, এই দুটি দেশের জন-ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যথাক্রমে ২৪০ এবং ২৮১; কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড এই অতিমারীতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং ঘন জনবসতির সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সম্ভবত নিশ্চিত কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও বিষয়টি ভবিষ্যতের গবেষণার বিষয়, তাই চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কিছুটা অনুমান বোধহয় করাই যায় যে, মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপন চর্চা, অভ্যেস ও সামাজিক পরিমণ্ডল এই ভাইরাসের সংক্রমণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। উন্নত এই দেশগুলিতে অবশ্য

মৃত্যুর হার বেশ বেশি। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশ ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার অনেক কম, তবে বিষয়টি ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় নিশ্চয়ই হবে, সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আমাদের দেশে এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয় গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে। গত একশো বছরের ছোট কিছু মহামারীর ঘটনা বাদ দিলে, ধরা যায় ১৯১৮-১৯ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা বা স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারীতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যাকে সংক্রমিত করেছিল। অনুমান পৃথিবী জুড়ে ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। শুধুমাত্র অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এই ইনফ্লুয়েঞ্জা অতিমারী বা মারণ জ্বরে। সেন্সাস বিভাগের জনগণনার নথি থেকে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ১৯০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি দশকের হিসাব, সংক্ষিপ্ত আকারে নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত অর্থাৎ এই পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১২ কোটি, অথচ পরবর্তী ৭০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ কোটি। জনগণনার রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ, আর মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯০১ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত — এই ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ অথচ পরবর্তী ১০ বছরে (১৯১১-২১) জনগণনার হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নেমে যায় শূন্য শতাংশেরও নীচে। কারণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ইনফ্লুয়েঞ্জা-অতিমারির প্রভাবে মৃত্যুর হার জন্মের হারকেও অতিক্রম করে যায়। পরবর্তী ১০ বছরের শেষে (১৯৩১) জনগণনায় দেখা যায় যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১ শতাংশ। অন্যদিকে ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে লোকসংখ্যা বেড়েছে ১৩.৩ শতাংশ, অথচ এই দশকে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল প্লেগ ও কলেরা মহামারীর কারণে মৃত্যু। দেশভাগের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ও পাঞ্জাবে লোকসংখ্যা কিছুটা হয়তো বেড়েছিল, তবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এসব সত্ত্বেও লোকসংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি কৌতূহলের বিষয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯২৮ সালে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর হাত ধরে পেনিসিলিন আবিষ্কার, যা এক নতুন যুগের সূচনা করে। ৪০-এর দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পেনিসিলিন বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বাণিজ্যিক প্রয়োগ শুরু হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে পৃথিবীব্যাপী এই জীবনদায়ী ওষুধ হিসাবে প্রসার লাভ করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত মৃত্যু মিছিলকে আটকানো সম্ভব হয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কিছুটা হলেও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, জীবনদায়ী ওষুধের প্রয়োগ ও শিক্ষার প্রসার, মানুষের গড় আয়ু বাড়তে সাহায্য করে যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এটাই ছিল সামগ্রিক পরিস্থিতি।

কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, যা সমস্ত শ্রেণীর মানুষকেই সংক্রামিত করেছে। বেশ কিছুসংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যার বেশিরভাগটাই শহরাঞ্চলে। যদিও এখন সংক্রমিতের সংখ্যা কমে আসছে, তবে নতুন করে কোভিড-১৯-২.০ ভাইরাসের স্ট্রেন আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতির জন্যে দেশের মানুষ প্রস্তুত ছিল না এবং গত একশো বছরের ইতিহাসে এমন অভিজ্ঞতা মানুষের হয় নি। আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীভুক্ত দেশে বাস করি, এখনও উন্নত দেশের তকমা জোটে নি, অথচ শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ২০০১ থেকে ২০১১ জনগণনার হিসাব

তুলনা করলে দেখা যাবে যে, শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা ২৭.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩১.১৬ শতাংশ আর গ্রামাঞ্চলে ৭২.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৬৮.৮৪ শতাংশ। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে অনুমান করা হচ্ছে যে ২০৫০ সালে ৫০ শতাংশ মানুষ শহরেই বসবাস করবে। কারণ গ্রাম ও শহরের অসম উন্নয়ন; স্বভাবতই মানুষ উন্নত-জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে শহরেই ভিড় করবে। করোনা অতিমারীর শুরুতে লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের রাজ্যে পরিযাণ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রদীপের শিখার নীচে অন্ধকারের মতো এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষ কখনোই উন্নয়নের আলোর স্পর্শটুকু পায় না।

আমাদের দেশের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলি মূলত শহরকে কেন্দ্র করেই বাস্তবে রূপ পায়, অন্যদিকে সত্যিকারের গ্রামীণ উন্নয়ন নীরবে নিভৃতে অধরাই থেকে যায়। যেমন ধরা যাক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত চরিত্র; বাজেটের বেশিরভাগ অর্থই খরচ করা হয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বঞ্চনা এখনও সমানভাবে চলে আসছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পঞ্চম শ্রেণীতে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পড়তে আসছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ ঠিকমতো

প্রতি ১০ বছরে	জনসংখ্যা কোটির হিসাবে	প্রতি ১০ বছরে বৃদ্ধি
১৯০১	২৩.৮৪	—
১৯১১	২৫.২১	৫.৮%
১৯২১	২৫.১৩	-০.০৩%
১৯৩১	২৭.৯০	১১%
১৯৪১	৩২.০০	১১.৮%
১৯৫১	৩৬.০০	১৩.৩%
২০১১	১২১.০০	—
২০২০	১৩৫.০০	১২%

লিখতে-পড়তে পারছে না। এই অবস্থা প্রমাণ করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা উপেক্ষিত। কিছু সুবিধা সহ স্কুলে মিড-ডে মিল-এর সুবাদে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি করে স্কুলে আসতে উৎসাহিত করছে ঠিকই কিন্তু পঠন-পাঠনের মান সেভাবে উন্নত করা যায় নি। সহজেই অনুমেয় এই বিপুল সংখ্যক ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাকে প্রকৃত মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা যাচ্ছে না। এ এক চরম ব্যর্থতা এবং সমাজের গভীর অসুখ। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরটিকে মজবুত করতে হবে, যতদিন না তা করা যাচ্ছে ততদিন সেই 'উন্নয়নশীল ভস্মে ঘি' ঢালাই সার হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যুদ্ধোত্তর ভিয়েতনামের কথা। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর ১৯৭৫ সালে নতুন ভিয়েতনাম সরকার যখন দেশের দায়িত্ব নেয়, তখন তাদের নির্দেশ ছিল যে, তিন বছর শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে এবং প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে গ্রামে যেতে হবে, যাতে দেশ গঠনে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করা— লক্ষ্য ছিল সবাইকে একই শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং দেশের পুনর্গঠনের জন্যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখেছি কত দ্রুত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভিয়েতনাম নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। এই দেশ করোনা-অতিমারি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

করোনা অতিমারী আমাদের দেশের আধা শহর ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ দিকটি বেআব্রু

করে দিয়েছে। দেশের সর্বস্তরে স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাবার সুযোগ আমাদের সামনে এখন এসেছে, প্রয়োজন সরকারি ও অসরকারি স্তরে আন্তরিক কল্যাণমুখী প্রয়াস, যার মূল ভিত্তি হবে সকল সাধারণ মানুষের জন্যে সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ন্যূনতম রুজি রোজগারের নিশ্চয়তা। আমাদের দেশে খাপছাড়াভাবে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঠিকই এবং কাজও হচ্ছে, কিন্তু তার সুফল সেভাবে মিলছে না। বর্তমানে দেশজুড়ে ভাইরাসজনিত অসুখে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা দরকার, সেইমতো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, মূল লক্ষ্যই হবে মানুষকে শহরমুখী হওয়া থেকে বিরত করা। আধুনিক শহরের প্রাণের স্পন্দনকে সচল রেখেছে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং গ্রামীণ মানুষের অনিয়ন্ত্রিত শ্রম, অথচ এইসব মানুষই উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত। গান্ধীজি বলেছিলেন দেশের মানুষকে গ্রামেই থাকতে হবে কারণ ভারত আত্মার অধিষ্ঠান গ্রামের কুটীরে। ভবিষ্যতে আমাদের আরও গভীর সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে, তার জন্যে প্রস্তুতি এখনই শুরু করতে হবে।

সমগ্র দেশের তুলনায় এখন আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ও জনঘনত্বর অবস্থাটা কি রকম একটু দেখা যাক। বিগত জনগণনার হিসাব অনুযায়ী ২০১১ থেকে ২০২০ সালে সম্ভাব্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যদি ১২ শতাংশ হারে হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে লোকসংখ্যা হওয়া উচিত ১০.২৩ কোটি। এই হিসাবে দক্ষিণবঙ্গের নয়টি জেলায় যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান ও নদীয়ায় লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। আর বাকি পাঁচটি খানিকটা অনুন্নত জেলা যথাক্রমেঙ্খ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম-বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের মোট লোকসংখ্যা ওই বৃদ্ধির হার অনুযায়ী হবে প্রায় দুই কোটি। সমষ্টিগতভাবে দক্ষিণবঙ্গের ১৪টি জেলায় মোট লোকসংখ্যা ওই বৃদ্ধির হার অনুযায়ী হবে প্রায় সাড়ে সাত কোটি। বাকি ২.৭৩ কোটি লোকসংখ্যা উত্তরবঙ্গের ৯টি জেলায়। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতার জনসংখ্যা কমেছে ১.৬৭ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় বেড়েছে যথাক্রমে ১২ ও ১৩.৫ শতাংশ। জনঘনত্বের হিসাব অনুযায়ী এই তিনটি জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মানুষের বাস যথাক্রমে ২৪২৫০, ২৫০০ ও ৩৩০০। উল্লেখ্য কলকাতার জনসংখ্যা গত দশ বছরে অপরিবর্তিত থেকেছে (কলকাতা কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী), উত্তর ২৪ পরগনার জনসংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা কারণ রাজারহাট-নিউটাউন-এর দ্রুত সম্প্রসারণ। অন্যদিকে নদিয়ার কল্যাণীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু নতুন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, ফলত নদিয়া জেলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (KMDA) উন্নয়নমূলক কাজের ভৌগোলিক সীমানা কলকাতা ছাড়া আরও পাঁচটি জেলাকে নিয়ে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়া। এই প্রতিটি জেলাতেই কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ সবথেকে বেশি রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায়। KMDA-এর অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৫০০ জন এবং এই জেলাগুলিতেই ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার সবথেকে বেশি। এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে অবশ্যই জন-ঘনত্বের সাথে ভাইরাস সংক্রমণের যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং শহরকেন্দ্রিক অপরিকল্পিত উন্নয়ন মানুষকে আরও বিপদের দিকে নিয়ে যাবে, তাই প্রয়োজন প্রত্যন্ত জেলায় ও গ্রামের দিকে ফিরে তাকানো এবং সুষ্ঠু গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে কালবিলম্ব না করে। মূল লক্ষ্য হবে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রুজি-রোজগারের সুবন্দোবস্ত করা। সেই সাথে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করে তুলতে হবে।

এখন আমরা তুলনামূলক উদাহরণ হিসাবে দেখাব যে, আমেরিকার সবথেকে উন্নত রাজ্য নিউ ইয়র্ক, উন্নয়নশীল দেশ ভিয়েতনাম এবং আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিরূপ এই কোভিড-১৯ অতিমারী সংক্রমণের ফলে। দ্বিতীয় সারণিতে এই দেশ ও রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা, জনঘনত্ব, কোভিড-১৯ সংক্রমণ, সংক্রমণজনিত কারণে মৃত্যু দেখানো হয়েছে; লক্ষণীয় ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামের, যার লোকসংখ্যা আমাদের রাজ্যের সমান, সেখানে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ ও মৃত্যু এখন পর্যন্ত সেভাবে হয় নি। নিউ ইয়র্ক রাজ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ ১০ লক্ষেরও বেশি এবং মৃত্যু প্রায় ৩৮ হাজার। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ভাইরাস সংক্রমণ সাড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি এবং মৃত্যু প্রায় ১০ হাজার। অথচ আজ পর্যন্ত ভিয়েতনামের সর্বমোট সংক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিদিনের সংক্রমণের প্রায় সমান।। মৃত্যু ৩৫ জন মানুষের। এখন প্রশ্ন হল ভিয়েতনাম যেটা করতে পারছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বা রাজ্য সেটা করতে পারছে না কেন? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভিয়েতনাম প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমানভাবে দেশের সর্বত্র প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কায়েম করতে পেরেছে, সেই সাথে সামাজিক বৈষম্য অনেকটাই কম। ভিয়েতনামে নবম শ্রেণী (১৪-১৫ বছর) পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রতিটি ছেলেমেয়েদের জন্যে, বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী (১৭-১৮ বছর) বা সেকেন্ডারি ডিপ্লোমা উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যার গড় ৯৪ শতাংশ। শিক্ষাখাতে সে দেশে খরচ জিডিপি-র ৬.৩ শতাংশ এবং দ্রুত উন্নয়নের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চশিক্ষার ব্যয় ক্রমবর্ধমান। সে দেশের সরকারের লক্ষ্য প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। আমরা সবদিক থেকে অনেক পিছিয়ে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণের শুরুতে সমাজবিজ্ঞানী কুমার রাণা ভিয়েতনাম ঘুরে এসে আনন্দবাজার পত্রিকায় (৭ এপ্রিল, ২০২০) একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, ''...ব্যবস্থাটা এমনই, কোয়ারান্টিনে কাটানো এক ব্রিটিশ নাগরিকের ভাষায়, 'থাকার জন্য এত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় আমার বাড়িতেও নেই।' ...সন্দেহভাজনদের পরীক্ষা, কোয়ারান্টিন, স্কুল-কলেজ বন্ধ এবং সু-উন্নত চিকিৎসা — ভিয়েতনামের গড়ে তোলা এই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষার পক্ষে হেরে যাওয়াটাই বরং কঠিন। এখনও চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় অনেক দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের নিদর্শন ভিয়েতনাম রেখে চলেছে, বিশ্বের কাছে সেটা একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার।''

উন্নত দেশগুলির সমস্যা ভিন্ন ধরনের, এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তর গবেষণা হবে, তবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্বলতাগুলি সহজেই অনুধাবন করা যায়। আমাদের রাজ্যে যদিও জনঘনত্ব অনেক বেশি তবুও বলা যায় দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অবহেলার শিকার। প্রকৃত মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে না, তাই তারা প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজের সর্বক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমানে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খানিকটা পরিকল্পিত উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেলেও রাজ্যজুড়ে সামগ্রিক উন্নয়ন এখনও অধরা। কেএমডিএ-র ভৌগোলিক সীমানার বাইরে সুষম উন্নয়নের পরিকল্পনা এখনি গ্রহণ করতে হবে, যাতে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের পরিযাণ রোধ করা যায়। রাজ্যের প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন ভীষণ জরুরি ছিল, বেশ কিছু ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং অন্যগুলির কাজ চলছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, বিস্তীর্ণ চা-বাগানকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চল এবং নিবিড় অরণ্য সম্পদ দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত, দরকার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু রূপায়ন। দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষের বাস, যা নিউজিল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার সমান, সেখানেও প্রয়োজন সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা। সব ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত পরিবেশের বিপন্নতাকে রোধ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। অবশ্যই সমস্ত সংস্থাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে। জনসংখ্যাকে ভার হিসাবে না দেখে তাদেরকে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে হবে, করোনা অতিমারী সম্ভবত সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে চলেছে। সুযোগও তৈরি করে দিয়েছে আমাদের ঘুরে দাঁড়াবার, তাই দায়িত্ব আমাদের সবার।

দেশ/রাজ্য	মোট লোকসংখ্যা কোটিতে	গড় জনঘনত্ব/ বর্গ কিলোমিটার	মোট কোভিড-১৯ সংক্রামিত ব্যক্তির (জানুয়ারি২, ২০২১)	
			সংখ্যা	মোট মৃত্যু
নিউ ইয়র্ক স্টেট	১.৯৫	১৬০	১০০৮৫০০	৩৮১৫৫
ভিয়েতনাম	১০	৩০৫	১৪৭৪	৩৫
পশ্চিমবঙ্গ	১০	১০২৯	৫১৬৫০৫	৯৭৫৪

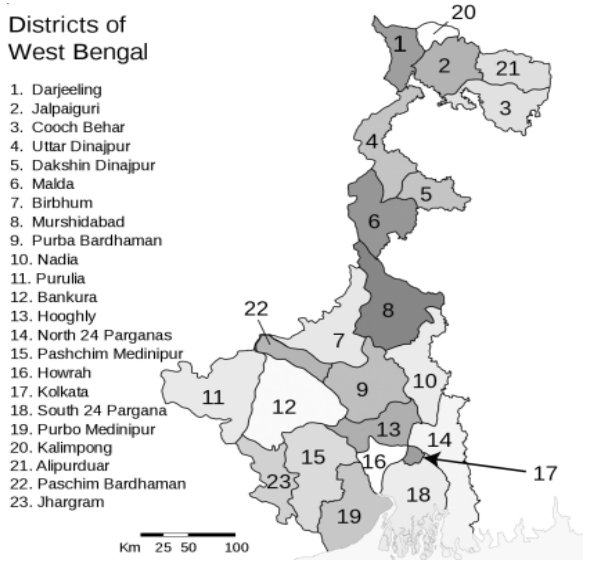

সহায়ক সূত্র : ১। জন হপকিন্স করোনা ভাইরাস রিসোর্স সেন্টার, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা।
২। সেন্সাস বিভাগ, ভারত সরকার।
৩। স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৪। ইন্টারনেট আর্কাইভ